বদ্যিনাথের বড়ি

লীলা মজুমদার

বদ্যিনাথের বড়ি

কোন সকালে কলু কদ্দিন দেখেছে রাস্তার মধ্যিখানে লোহার গোল ঢাকনি খুলে খ্যাংরাকাঠির মতন গোঁফওয়ালা লোক, ছোটো বালতি-হাতে দড়িবাঁধা কালো ছেলেকে নামিয়ে দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওত পেতে বসে থাকে। লোকটার খোঁচা খোঁচা দাড়িতে কাদার ছিটে— অমুদা যখন দাড়ি কামাত না তখন তাকে যেমন দেখাত সেইরকম দেখায়। ছোটো ছেলেটা হয়তো ওর ভাইপো হবেও-বা। ওর নাম হয়তো ছক্কু, ওর গায়ে মোটে কাপড় নেই, কিন্তু কানে সোনালি রঙের মাকড়ি, গলায় মাদুলি বাঁধা। বুবু বলে নাকি সত্যি সোনার নয়; ওরা গরিব কিনা, খেতেই পায় না, ও পেতলের হবে। কলু আর বুবু ছাড়া ওদের কেউ দেখেই না। সামনে দিয়ে দেবরঞ্জন মামা, অমুদা, ননিগোপালরা সবাই চলে যায়, তাড়াতাড়ি কোথায় কোন বন্ধুর বাড়ি— ওদের চোখেই পড়ে না। কিন্তু কলু দেখেছে লোকটা মাঝে মাঝে বালতি টেনেটুনে উপরে তোলে, সেটা থাকে কাদায় ভরা; সেই নোংরা কাদা রাস্তার পরিষ্কার ডাস্টবিনে ঢেলে আবার বালতি নামিয়ে দেয়। কাদা ছাড়া কখনো কিচ্ছু ওঠে না। কত কী তো হারিয়ে যায়, কিন্তু ওর ভিতর থেকে কিছু কক্ষনো বেরোয় না। দাদা বলেছিল বিদ্যাধরী নদীর সঙ্গে ওর সোজাসুজি যোগ আছে, ওর ভিতর কুঁদো কুমির ছেলেপুলে নিয়ে হুমো দিয়ে থাকে, কই বালতিতে তার ডিমটিম তো কক্ষনো পাওয়া যায় না!

দাদার ফাউন্টেন পেন হারিয়ে গেল; চিনুদার কবিতার খাতা হারিয়ে গেল; বদ্যিনাথের নতুন চটি হারিয়ে গেল গোরামামার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে; সেইদিনই আবার পাল সাহেবের ছাতাও কোথায় হারিয়ে গেল; ছোড়দির চুড়ি ড্রেনের ভিতর তলিয়ে গেল; এতসব গেল কোথায়? তার কিচ্ছু মোটে কোথাও পাওয়াই গেল না। অথচ সেই লোক দুটো কত কাদা ওঠাল!

রাত্রে মাস্টারমশাই পড়াতে আসেন, বুবু পড়ে না, কলু পড়ে।—রোজ রাত্রে, রবিবার ছাড়া। কলু কত সময়ে সেই দু-জনের কথা ভাবে, সন্ধি-সমাস গোল হয়ে যায়, মাস্টারমশাই রেগে কাঁই! বলেন, 'ওরে আহাম্মুক! আমার ছেলে বিধুশেখর তোর অর্ধেক বয়েসে তোর তিন গুণ পড়া শিখত!'

ছেলে বটে ওই বিধুশেখর! তার কথা শুনে শুনে কলু তো হেদিয়ে গেল। সে কক্ষনো হাই তুলত না, কক্ষনো চেয়ারে মচমচ শব্দ করত না, কক্ষনো চটি নাচাত না। প্রথম প্রথম ভাবত, তা হলে সে বোধ হয় এতদিনে নিশ্চয় মরে গিয়েছে। কিন্তু মাস্টারমশাই বলেছেন সে নাকি বিয়ে করে কোথায় পোস্টমাস্টারি করে।

একদিন বদ্যিনাথ কতকগুলো সাদা বড়ি এনেছিল। বলেছিল ওগুলো নাকি ছানা বাঁদরের রস দিয়ে তৈরি, কোন কবিরাজের কাছ থেকে এনেছে। নাকি অনেকদিন আগে মানুষদের পূর্বপুরুষরা বাঁদর ছিল, সেই বাঁদুরে রক্ত মানুষের গায়ে আছেই আছে, ওই আশ্চর্য বড়ি খেলে তাদের আবার বাঁদর হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে— ওই একরকম ধাত কিনা! কলু তার দুটো বড়ি চেয়ে রাখল, কাজে লাগতে পারে।

মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি বহুদূরে, উনি তবু রোজ ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হতেন। কী শখ বাবা পড়াবার! মাঝে মাঝে দাদারা এসে মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ত, কলুকে শব্দরূপ মুখস্থ করতে হত। কলুর চোখ বুজে আসত, মাথা ঝিমঝিম করত, আর দাদারা শুধু কথাই বলত। কলু দড়িবাঁধা ছেলেটার কথা ভাবত, আর শুনতে পেত পাশের বাড়ির ছোটো ছেলেরা খেতে বসে হল্লা করছে। আর ভাবত, এমন অবস্থায় পড়লে মাস্টারমশাইয়ের ছেলে সেই বিধুশেখর কী করত!

এক-এক দিন যেই পড়া শেষ হয়ে আসত, বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি নামত। মাস্টারমশাই হয়তো বাড়িতে ছাতা ফেলে আসতেন, আটকা পড়তেন।

কলু ব্যস্তভাবে বলত, 'ছাতা এনে দিই, ভালো ছাতা?'

মাস্টারমশাই বলতেন, 'না না, থাক, থাক। একটু বসে যাই।'

কলু আবার সেই মচমচে চেয়ারটাতে বসত।

মাস্টারমশাই তাঁর ছোটোবেলাকার অনেক গল্প বলতেন। তখন বাবাও নাকি ছোটো ছিলেন, একসঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন, পুজোর সময় কাদের বাড়ি যাত্রাগান হত, পালিয়ে গিয়ে শুনতেন। কলুর চোখ জড়িয়ে আসত, হাই তুলতে সাহস হত না; ভাবত এতক্ষণে সেই দড়িবাঁধাটা নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। হাইগুলো মাথায় গিয়ে জমাট বাঁধত, চম্‌কে জেগে যেত, শুনত মাস্টারমশাই বলছেন, 'দে বাবা, ছাতাই দে। এ আর আজ থামবে না।'

কলু ছুটে ছাতা এনে দিত, মাস্টারমশাই চলে যেতেন আর কলুর ঘুমও ছুটে যেত।

এমনি করে দিন যায়। একদিন বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, মাস্টারমশাই বিধুশেখরের কথা বলছেন। সে শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে কক্ষনো বায়োস্কোপ দেখেনি, থিয়েটারে যায়নি, বিড়ি টানেনি, গল্পের বই খোলেনি। বলতে বলতে মাস্টারমশাই বললেন, 'ওরে, চুপিচুপি দুটো পান সেজে নিয়ে আয় তো দেখি।'

কলু দৌড়ে গেল, পান দিল, চুন দিল, দুটো করে এলাচদানা দিল, বড়ো বড়ো সুপুরির কুচি দিল, আর সবশেষে কী মনে করে বদ্যিনাথের সেই আশ্চর্য বড়িও একটা করে গুঁজে দিল।

মাস্টারমশাই একটা পান তক্ষুনি মুখে পুরে দিলেন, একটা বইয়ের মতন দেখতে টিনের কৌটোতে ভরলেন। কলু তাক করে রইল। প্রথমটা কিছু মনে হল না— তারপর ভালো করে দেখল, মনে হল মাস্টারমশাইয়ের কপালের দিকটা কীরকম যেন লম্বাটে দেখাচ্ছে, থুতনিটা যেন ঢুকে পড়েছে, চোখ দুটোও কীরকম পিটপিট করতে লাগল।

কলুর বুকের ভিতর কেমন ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। মাস্টারমশাই বাড়ি যান-না কেন? যদি হঠাৎ ল্যাজ দুলিয়ে হুপ করেন? এমন সময়ে বৃষ্টি থেমে গেল, মাস্টারমশাই ধুতির খুঁটটা কাদা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলে গেলেন। কলু ভাবতে লাগল, ক-দিন আর ধুতির খুঁট? অন্য পানটা বিধুশেখর বোধ হয় আজ রাত্রে চেয়ে নেবে, তারপর সেই-বা ধুতি নিয়ে করবে কী!

পরদিন বিকেলে বই নিয়ে কলু অনেকক্ষণ বসে রইল, কিন্তু মাস্টারমশাই এলেন না। সন্ধ্যাবেলা বাবা বললেন, 'ওরে তোর মাস্টারমশাই যে হেডমাস্টার হয়ে বিষ্টুপুর চলে গেলেন।'

কলু ভাবল, বিষ্টুপুর কেন, কিষ্কিন্ধে হলেও বুঝতাম!

তারপর বহুদিন চলে গেছে। কলুর নতুন মাস্টার এসেছেন, তাঁর ছেলের নাম বিধুশেখর নয়, তাঁর ছেলেই নেই। তিনি কলুকে রোজ ফুটবলের, ক্রিকেটের গল্প বলেন— কিন্তু কলুর থেকে থেকে মনে হয়, অন্ধকারে ওবাড়ির পাঁচিলে দুটো কি ল্যাজঝোলা বসে আছে! একটার মুখ কেমন চেনা চেনা, অন্যটা বোধ হয় বিধুশেখর!

ভূতের ছেলে

রাত যখন ভোর হয়ে আসে তখন ওই তিন-বাঁকা নিম গাছটায় হুতুম প্যাঁচাটারও ঘুম পায়। নেড়ু দেখেছে ওর কান লোমে ঢাকা, ওর চোখে চশমা, ওর মুখ হাঁড়ি। হুতুমটা কেন যে চিল-ছাদের ছোটো খুপরিতে পায়রাদের সঙ্গে বাসা করে না, নেড়ু ভেবেই পায় না। বোধ হয় ভূতদের জন্যে।

নিম গাছতলায় ভূত আছে।

একদিন ভোর বেলায়, মই বগলে ছাগলদাড়ি লোকটা রাস্তার আলো নিবিয়ে নিবিয়ে চলে গেলে পর, নেড়ু দেখেছিল কোমরে রুপোর ঘুনসিওয়ালা, মাথায় গুটিকতক কোঁকড়া চুল, ভূতদের ছোটো কালো ছেলে নিম গাছতলায় কাঁসার বাটিতে নিম ফুল কুড়োচ্ছে। নেড়ুকে দেখেই ছেলেটা এক চোখ বুজে বগ দেখাল। নেড়ু ভাবল, ভূত কিনা, তাই ভদ্রলোক নয়।

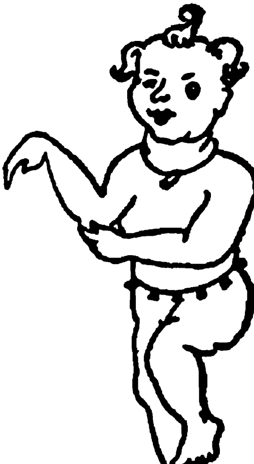

তারপর অনেক দিন নেড়ু অনেক বেলা পর্যন্ত গাঁক গাঁক করে ঘুম লাগিয়েছে, শেষটা এমনকী ভজাদা এসে ঠ্যাং ধরে টেনে খাট থেকে নামিয়েছে। নেড়ু কিন্তু একটুও রেগেমেগে যায়নি। ও তো আর সুকুমারদা নয় যে মুখ দেখলে বালতির দুধ দই হয়ে যাবে! কিন্তু সেই ছানাটাকে আর দেখা হয়নি।

শেষটা হঠাৎ একদিন নেড়ু স্বপ্ন দেখল কালো ছেলেটা ওকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে নাকের ফুটোয় কাগের নোংরা পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। রাগের চোটে নেড়ুর ঘুম ছুটে গেল। ইচ্ছে করল ছেলেটার মাথায় সুপুরি বসিয়ে লাগায় খড়ম! খানিক চোখ রগড়ে, জিভ দিয়ে তালুতে চুকচুক করে চুলকে, রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখল, মই বগলে সেই লোকটা। তারপর নিমতলায় তাকিয়ে দেখল ভূতের ছানাটা একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বেজায় হাসছে, যেন কালো ভাল্লুক মুলো চিবোচ্ছে। সে কী বিশ্রী হাসি! গোটা কতক শুট লাগালে হয়!

ছেলেটা নেড়ুকে দেখে আজ আর বগ দেখাল না, ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। ভূতের ছেলে বাবা! বিশ্বাস নেই! নেড়ুর একটু ভয় করছিল, ঘরের ভিতর এদিক-ওদিক একবার তাকাল। দেখে

কিনা কুঁজোর পিছন থেকে একটা এয়া বড়া টিকটিকি মুণ্ডু বাড়িয়ে, ঘোলাটে চোখ পিটপিট করে ঘুরিয়ে আহ্লাদে আহ্লাদে ভাব করে টিক-টিক-টিক করে আবার মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে নিল, কেমন যেন তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব! নেড়ুর ভারি রাগ হল। কী, ভয় পাই নাকি!

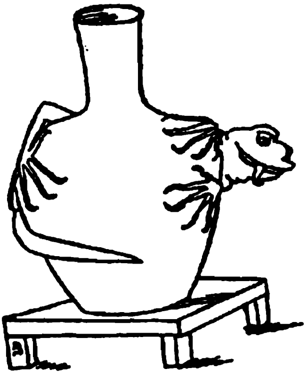

নেড়ু আস্তে আস্তে নীচে গেল। দাঁত মাজল না। চোখ ধুল না। তাতে কী হয়েছে? সেই ছেলেটার তো নাকে সর্দি!

নিমতলায় যাবার পথে দেখে দুই দিকে দেয়ালে ঘুঁটে দেওয়া। কতকগুলো গোল গোল মতন, সেগুলো ধোপার মা দিয়েছে; আর কতকগুলো ঠ্যাংওয়ালা, সেগুলো ধোপার মায়ের মেয়ে দিয়েছে। কিন্তু নিমতলায় গিয়ে দেখে ছেলেটা কোথায় যেন সট্‌কে পড়েছে। কী জানি ভোর হয়ে এসেছে, আলো-টালো দেখে উঠে গেল না তো!

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় নেড়ুর দাঁত ব্যথা করছিল, তাই লবঙ্গ-জল দিয়ে মুখ ধুয়ে জানলার উপর বসে ভাবছিল, আচ্ছা নেপাল খুড়োর কেনই-বা অমন সিন্ধুঘোটকের মতন গোঁফ, আর বিধুদাই-বা কেন দিনরাত টিকটিক করেন!

এদিকে ওদের বাড়ির দারোয়ান কী যেন গাইছিল, মনে হচ্ছিল—

'নিমতলাতে আর যাব না,
কেলো-ভূ-তে-র-কা-লো-ছা-না!'

হঠাৎ শুনল, 'এইয়ো!'

চমকে আর একটু হলে ধুপুস করে পড়েই যাচ্ছিল! আবার শুনল, 'এইয়ো!'

চেয়ে দেখে নিমতলায় আবছায়াতে সেই ভূতের ছানাটা! নেড়ু গলা নামিয়ে হিন্দিতে ফিসফিস করে বললে, 'হাম শুনতে পাতা।'

ছানাটা আবার বাংলায় বললে— 'সকালে কি পায় শেকড় গজিয়েছিল?'

নেড়ু বললে, 'আমি তো গেলুম, তুমিই আলো দেখে চলে গেছিলে।'

ছেলেটা বললে, 'দ্যুৎ, আলো নয়, বাবাকে দেখে।'

নেড়ু ভাবল— কেন, বাবাকে দেখে চলে যাবে কেন? নেড়ু শুধু এক বার বাবাকে দেখে চলে গিয়েছিল— সেই যেবার দরোয়ানের হুঁকা টেনেছিল। তাই জিজ্ঞেস করল— 'হুঁকো টেনেছিলে?'

ছেলেটা মাথা নেড়ে বললে, 'দুৎ। তার থেকে বিড়ি ভালো।'

'তোমার বাবা কি গাছে থাকেন?'

'দুৎ! থাকেন না, চড়েন। আমি অনেক তাগ করে থাকি, কিন্তু কক্ষনো পড়েন না!'

'তিনি কি প্যাঁচা?'

'দুৎ—!' তারপর ছেলেটা একটা কথা বললে যেটা মা একদম বলতে বারণ করেছেন। নেড়ু বললে, 'ছি!— আচ্ছা, তাঁর পা কি উলটোবাগে লাগানো?'

এবার ছেলেটা বেদম রেগে গেল। ভুরু কুঁচকে, ফোঁসফাঁস করতে লাগল, আর হাতটাকে ঘুসি পাকাতে আর খুলতে লাগল, যেন এই পেলেই সাবড়ে দেয়! তারপর কী ভেবে ঠান্ডা হয়ে বললে—

'ওই যে মিস্ত্রিগুলো সারাদিন বাঁশের টঙে চড়ে তোমাদের বাড়ির বিশ্রী জানালাগুলোতে তোমার গায়ের রঙের মতন বদ সবুজ রং লাগায়, ওদের একটা দড়িবাঁধা রঙের টিন, আর একটা বড়ো চ্যাপটা রং লাগাবার জিনিস যদি আমাকে এক্ষুনি না এনে দাও তাহলে তোমাকে, তোমার বাবাকে, তোমার দাদাকে, আর তোমার মাকে কচুকাটা করব। তোমাদের ছোটো খুকিকে পানের মশলা বানিয়ে কড়কড়িয়ে চিবিয়ে খাব। তোমাদের মাসি-পিসি যে যেখানে আছে তাদের থেঁতলো করব! তোমাদের রুটিওয়ালা, ঘিওয়ালা, আর যা যা তোমরা রাখ সব ক-টাকে লম্বা লম্বা ফালি করে ছিঁড়ে কাপড় শুকুবার দড়িতে ঝুলিয়ে শুঁটকি মাছ বানাব। আর তোমার যত বন্ধু আছে সবগুলোকে নুনজল দিয়ে কাঁচা কাঁচা গিলে খাব।'

বাপরে, কী হিংস্র খোকা!

নেড়ু তাড়াতাড়ি একটা টিন, আর দু-তিনটে বুরুশ তাকে দিয়ে এল। ছেলেটা ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে হাসতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

রাতে নেড়ু শুনতে পেল ফিসফিস করে কারা কথা বলছে। কানে আঙুল দিয়ে শুল, তবু মনে হল কে যেন বলছে—

'আছে— আছে!
নিম গাছে!'

নেড়ু ভাবলে, ওরে বাবা, কী আছে রে?— পান্তভূত? কবন্ধ? পিশাচ? স্কন্ধকাটা? গন্ধবেনে? শাঁখচুন্নি? পেতনি? প্যান্তাখেঁচি?

নেড়ু তো নাক-মুখ ঢেকে রাম ঘুম লাগাল।

পরদিন সকালে নীচে যাবার সময় সিঁড়ির জানলা দিয়ে দেখে, রাস্তায় ওবাড়ির বড়ো কর্তা, এবাড়ির দরোয়ান, দাদা, বাবা, মন্টুর বাবা, দিনদা, আরও কত কে। সবাই ঠ্যাং হাত ছুঁড়ে বেজায় চ্যাঁচাচ্ছে!

নেড়ু আরও দেখল রাস্তার সব বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে সবুজ রং দিয়ে নানানরকম চিত্তির করা, পাশের বাড়ির সাদা গেটটা ডোরাকাটা!

হঠাৎ নেড়ুর চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবার জোগাড় করল— সেই হিংস্র ছানাটা পথের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে, তার এক হাতে রঙের বুরুশ, আর-এক হাতে রঙের টিন, এক কান ওবাড়ির দরোয়ান ধরেছে, আর-এক কান এবাড়ির লছমন সিং। আর ছেলেটা জোরসে চেল্লাচ্ছে।

তারপর ভঁক ভঁক করে একটা মোটর ডাকল, আর পথ ছেড়ে সকলে চলে এলেন। লছমন সিংও কানে শেষ একটা প্যাঁচ দিয়ে খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেড়ে দিল। তারপর ওদের বাড়ির দরোয়ান ওর হাত থেকে খামচা মেরে রঙের টিন আর বুরুশ নিয়ে গেল, হিন্দিতে আর বাংলাতে বিড়বিড় কীসব বকতে বকতে, শুট মারতে মারতে ওদের বাড়ি দিয়ে গেল!

নেড়ু পাড়াসুদ্ধ সক্কলের সাহস দেখে এমন হাঁ হয়ে গেল যে দেখতেই ভুলে গেল ছেলেটার পা উলটোবাগে লাগানো কি না!

গণশার চিঠি

ভাই সন্দেশ, অনেক দিন পর তোমায় চিঠি লিখছি। এর মধ্যে কত কী যে সব ঘটে গেল যদি জানতে, তোমার গায়ের লোম ভাই খাড়া হয়ে গেঞ্জিটা উঁচু হয়ে যেত, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসত, হাঁটুতে হাঁটুতে ঠকাঠক হয়ে কড়া পড়ে যেত!

আজকাল আমি মামাবাড়ি থাকি। আমার মনে হয় ওঁরা কেউ ভালো লোক নন। ওঁদের মধ্যে মাস্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন। আমি ম্যাজিক করতে দেখিনি, কিন্তু মন্দা বলেছে ওঁর ইস্কুলে বছরের প্রথম প্রথম মেলাই ছেলেপুলে থাকে, আর শেষের দিকে গুটিকতক টিমটিম করে। এদিকে মাস্টারমশাইয়ের ছাগলের ব্যাবসা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ কিন্তু বাবা সুবিধের কথা নয়। ছেলেগুলো যায় কোথা? মাস্টারমশাইয়ের চেহারাটাও ভাই কীরকম যেন! সরু-ঠ্যাং পেন্টেলুন উনি কক্ষনো ধোপার বাড়ি দেন না। সাদা-কালো চৌকোকাটা কোট পরছেন তো পরছেনই! আবার চুলগুলো সামনের দিকে খুদে খুদে, পিছনের দিকে লম্বা মতন, মধ্যিখানে দাঁড়-করানো! মাঝের গোঁফ বেঁটেখাটো, পাশের গোঁফ ঝুলো ঝুলো! ওঁর জুতোগুলো কে জানে বাবা কীসের চামড়া, কীসের তেলে চুবিয়ে, কীসের লোম দিয়ে সেলাই করা! ও বাবাগো, মাগো! ইচ্ছে করে ওঁর ইস্কুলে কে যাবে! মান্‌কে স্বচক্ষে দেখেছে, প্রথম সপ্তাহে ঘরের ভিতর সাতটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে দুটো ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই গা নাচাচ্ছেন! পরের সপ্তাহে মান্‌কে আবার দেখেছে ঘরের ভিতর ছ-টা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই জিভ দিয়ে দাঁতের ফোকর থেকে পানের কুচি বের কচ্ছেন। আবার তার পরের সপ্তাহে হয়তো দেখবে ঘরের ভিতর পাঁচটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে চারটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে; মাস্টারমশাই সেফটিপিন দিয়ে কান চুলকোচ্ছেন! শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালা মারা থাকবে, আর ঘরের বাইরে ন-টা ছাগল নটে চিবিয়ে দিন কাটাবে! মাস্টারমশাই খাঁড়ায় শান দেবেন!

তা ছাড়া সেই যে বিভু আরশুল্লা পুষত, একবার গুবরেপোকাও খেয়েছিল, সে বলেছে সে দেখেছে— মাস্টারমশাইয়ের বাক্সে হলদেটে তুলোট কাগজে লাল দিয়ে লেখা খাতা আছে, সে লাল কালিও হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে! ওঁর লেবু গাছে মাকড়সারা কেন জানি জাল বোনে না; পেঁপে গাছে সেই গোল-চোখ চকচকে জন্তু নেই, দেয়ালে টিকটিকি নেই। একটা হতে পারে মাস্টারমশাইয়ের রোগা গিন্নি মোটা বাঁশের ডগায় ঝাঁটা বেঁধে দিনরাত ওত পেতে থাকেন। কিন্তু কিছু বলা যায় না! মন্দা তো ওবাড়ি কোনোমতেই যায় না, মেজোও বাড়ির ছায়াটি মাড়ায়

না, আর ছোটো ছেলে ধনা, তার তো ওবাড়ির হাওয়া গায়ে লাগলেই সর্দি-কাশি হয়ে যায়। রামশরণ পর্যন্ত ওবাড়ির কুল খায় না, গুড়িয়ার মা শজনেডাঁটা নেয় না!

মা কিন্তু ওদের কুমড়োডাঁটা দিব্যি খান; আর বড়োমামা তো ওঁরই দাদা, ওই একই ধাত! ওঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারেন, কিন্তু ভূত কী ম্যাজিক, কী মন্তর-পড়া এসব একেবারে বিশ্বাস করেন না! কে জানে কোনদিন হয়তো কানে ধরে ওই ইস্কুলেই আমাকে ভরতি করে দেবেন, আর শেষটা কি সারাজীবন ব্যা-ব্যা করে নটে চিবুব? ইস্কুল থেকে ফিরতে দেরি দেখে বড়োমামা হয়তো চটি পায়েই খোঁজ নিতে গিয়ে দেখবেন, পাথরের উপর শিং ঘষে শান দিচ্ছি!— কেঁউ কেঁউ, ফোঁৎ ফোঁৎ!— কান্না পেয়ে গেল ভাই।

অ্যাদ্দিনে তোমায় লিখছি ভাই, আর হয়তো লেখা হবে না। দিব্যি টের পাচ্ছি দিন ঘনিয়ে আসছে। বড়োমামা যখন-তখন আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গোঁফের ফাঁকে বিশ্রী ফ্যাচরফ্যাচার হাসেন। বুঝছি গতিক ভালো নয়। দু-একবার তিন তলার ছাদে গিয়ে ব্যা-ব্যা করে ডেকে দেখেছি, সে আমার ঠিক হয় না। কেউ যখন দেখছে না গোটাকতক দুব্বো ঘাস চিবিয়ে দেখেছি— বদ খেতে, তাতে আবার ছোট্ট শুঁয়ো পোকা ছিল! খোকনকে বলেছি গলায় দড়ি বেঁধে একটু টেনে বেড়াতে, ও কিন্তু রাজি হল না। এদিকে অভ্যেস না থাকলে কী যে হবে তাও তো জানি না!

এইসব নানা কারণে এতকাল চিঠি লিকতে পারিনি, বুঝতেই তো পারছ।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আর তর সইল না। 'কেডস' পায়ে দিয়ে সুটসুট মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি বেড়া টপকে, ছাগলদড়ি ডিঙিয়ে, জানলার গরাদ খিমচে ধরে, পায়ের বুড়ো আঙুলে দাঁড়িয়ে চিংড়িমাছের মতন ডান্ডার আগায় চোখ বাগিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারলাম।

দেখলাম মাস্টারমশাই গলাবন্ধ কোট খুলে রেখে মোড়ায় বসে হুঁকো খেতে চেষ্টা করছেন, আর গিন্নি মাটিতে বসে কুলো থেকে খাবলা খাবলা শুকনো বড়ি তুলছেন— কোনটা আস্ত উঠছে, গিন্নি হাসছেন; কোনটা আধখ্যাঁচড়া উঠছে, গিন্নি দাঁত কিড়মিড় করছেন। আর মাস্টারমশাই গেলাস ভেঙেছেন বসে সমস্তক্ষণ বকবক করছেন ভাই, বড়ো ভালো লাগল।

কিন্তু আনন্দের চোটে যেই খচমচ করে উঠেছি, মাস্টারমশাই চমকে বললেন, 'ওটা কী রে?' ভাবলুম এবার তো গেছি! কান ধরে ঝুলিয়ে ঘরে টেনে আনলেন, নখ দিয়ে খিমচে দিয়ে গিরগিটির মতন মুখ করে বললেন— 'ও বাঁদর!' বললুম, 'আজ্ঞে সার্, ছাগল বানাবেন না স্যার্!' বললেন, 'বাঁদর আবার কবে ছাগল হয় রে?' গিন্নিও ফিসফিস করে যেন বললেন, 'ওটিকে রাখো, আমি পুষব।'

ভয়ের চোটে কেঁদে ফেললুম। গিন্নি মাথায় হাত বুলিয়ে শিং আছে কি না দেখে বললেন, 'তোমার মতন আমার একটি খোকা ছিল।' জিজ্ঞেস করলুম, 'তার কী হল?' বললেন, 'তার এখন দাড়ি গজিয়েছে।' বলে বড়ো বড়ো বাতাসা খেতে দিলেন। তারপর বাড়ি চলে গেলাম। জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না, দাড়ির সঙ্গে সঙ্গে খুরও গজিয়েছিল কি না।

ইস্কুলের কথা এখনও কিছু ঠিক হয়নি, এই ফাঁকে তোমায় লিখছি। এ চিঠির আর উত্তর দিয়ো না। দেখা করতে চাও তো খোঁয়াড়ে-টোঁয়াড়ে খোঁজ কোরো। ইতি—

তোমার গণশা

আচার

অমৃতবাজার পত্রিকার টুকরোটা হাতে নিয়ে বাবার প্রকাণ্ড চটি-জোড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঘোতন খুব লক্ষ করে দেখল, পিসিমা এসে নিবিষ্ট মনে খোকনাকে ঠ্যাঙাচ্ছেন।

প্রথমে ডান কান প্যাঁচালেন, তারপর বললেন, 'হতভাগা ছেলে!' তারপর বাঁ গালপট্টিতে চড়ালেন, তারপর বললেন, 'তোকে আজ আমি—' তারপর বাঁ-কান প্যাঁচালেন— 'আদা-লঙ্কা দিয়ে ছেঁচব!' তারপর ডান গালপট্টিতে চড়ালেন— 'তেল-নুন দিয়ে আমসি বানাব।' তারপর পিঠে গুমগুম করে পিঠে গোটা দশেক কিল কষিয়ে, মাথা থেকে চিমটি চিমটি চুল ছিঁড়ে, জুলপি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ঠিক ভাঁড়ার ঘরের দরজার বাইরে! টিপ দেখে ঘোতন তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারল না।

আরেকটু হলে নিজেই ধরা পড়ে যাচ্ছিল। তবেই হয়েছিল! ভীষণ না রাগলে পিসিমার নাক কখনো ও-রকম ফোলে না। অমৃতবাজারের কুচিটুচি ফেলে ঘোতন তো হাওয়া! খোকনাটারও যা বুদ্ধি! এত করে বলে দেওয়া হল যেখানে হেয়ারপিন সেই পর্যন্ত পিসিমা পড়েছেন, আচারের জন্য তার এদিক থেকে কাগজ ছিঁড়িস! বোকা ভাবলে কি না 'এদিক' মানে পিছন দিক, মনেও গজালো না যে একটু পড়লেই ছেঁড়া পাতা এসে যাবে। মাথায় কি-চ্ছু নেই, এক যদি গোবর থাকে! বেশ হল! আচারও পেল না, ঠ্যাঙাও খেলো।

আবার পিসিমার টিপের কথা মনে হল। কী চমৎকার টিপ! সেই যে সেবার ক্রিকেট সিজন-এ পানু নিজের ব্যাট দিয়ে খুঁচিয়ে স্টাম্প উড়িয়ে দিয়ে, জিভ কেটে, মাথা চুলকে, তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে বাউন্ডারির দড়িতে ঠ্যাং আটকে খুঁটিসুদ্ধ দড়ি উপড়ে এনেছিল। বড়োকাকা ছিলেন ক্যাপ্টেন, তিনি এক হাতে পানুর শার্টের কলার আর এক হাতে পেন্টেলুন ধরে তাঁবু থেকে তাকে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়া টপকে ওপারে ফেলে দিয়েছিলেন, আর পিছন পিছন ওর জুতো, প্যাড, গ্লাভস, ব্যাট

ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, প্রত্যেকটি ওর গায়ে লেগেছিল! বাজে প্লেয়ার হলে কি হবে কী-রকম টিপ! পিসিমারই-বা হবে না কেন, ওঁরই তো দিদি!

ঘোতন এদিক ওদিক ঘুরে আচারের কথা ভুলতে চেষ্টা করল। নাঃ! খোকনটা আবার কোথায় উধাও মারল, তার যে পাত্তাই নেই!

অনেক খুঁজে দেখা গেল, ওই রেগেমেগে ভালো ভালো ব্যবহার-না-করা ডাক-টিকিটগুলো টেবিলের ঠ্যাঙে একটার নীচে একটা লাইন করে দিব্যি থুতু দিয়ে সাঁটছে! ছোঁড়ার সাহস আছে!

ঘোতনা কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল—

'লেগেছিল?'

খোকনা বললে, 'কী লেগেছিল?'

'কী মুশকিল! লাগবে আবার কীসে? আরে ঠ্যাঙানিতে, ঠ্যাঙানিতে!'

'উঁহু!'

'তবে যে দেখলুম মাথাটা এমনি হয়ে গেল?'

'ও-রকম মাঝে মাঝে হয়।'

'খাবি নাকি আচার?'

'না।'

'ঘেবড়ে গেছিস?'

'দুৎ! সত্যি বলছি, না।— আচ্ছা তুই আন তো দেখি।'

ঘোতন এক ছুটে ভাঁড়ার ঘরের দরজার কাছে চলে গেল। দরজার বাইরে সারি সারি বড়ির থালা অন্ধকারে এ-ওকে ঠেলাঠেলি করে চোখ টিপছে। সারা সকাল মা চিনু মিনুকে নিয়ে বড়ি দিয়েছেন। ঘোতন দেখেছিল মেয়েগুলোর কী বুদ্ধি! প্রথমটা বড়ি চ্যাপটা চ্যাপটা ঘুঁটের মতন হচ্ছিল। যেই মা বললেন যার বড়ি যত উঁচু তার বরের নাক তত উঁচু, অমনি বোকাগুলো টেনে টেনে বড়ির নাক তুলতে লাগল। বুঝবে শেষটা!

যাক, কিন্তু দরজায় যে তালা মারা! অ্যাঃ, মিলার লক! হেয়ারপিন পাকিয়ে ঘোতন তাকে এক মিনিটে শায়েস্তা করে দিল। আজ আর কোনো ভয় নেই। কী করবে পিসি? ঠ্যাঙাবে? ওঃ! ঠ্যাং নেই?

তাকে তাকে আচার! বড়ো বয়ামে, ছোটো বয়ামে, মাটির ভাঁড়ে পাথরের থালায়, শিশিতে, বোতলে। ঘোতনের চোখ দুটো চারদিকে পায়চারি করতে লাগল। ঠিক সেবারের বাঙালি পল্টনের মতন— একটা এগোনো, একটা পেছোনো, একটা লম্বা, একটা বেঁটে! বাঁকা লাইন, দুধের দাঁত পড়ে খোকনার যেমন ত্যাড়াব্যাঁকা দাঁত উঠেছিল সেইরকম। সত্যি সেপায়ের মতন। আনাড়ি সেপাইকে যেমন কাঁচা কাঁচা ধরে এনে এক পায়ে ঘাস বেঁধে মার্চ করায়— 'ঘাস বিচালি' 'ঘাস বিচালি'! লেফট রাইট লেফট রাইট তো আর বোঝে না!

আজ কে পিসিমাকে কেয়ার করে!

বয়ামের গায়ে টোকা মেরে মেরে ইচ্ছে করে ভিতরের আচারের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

কীরকম একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে আসছিল। ঘরের আনাচে-কানাচে ছুঁচোদের বাবা, মা, দাদা, দিদিরা চুপ মেরে কীসের যেন অপেক্ষা করছে! দেয়ালের গায়ে সুপুরির মতন কেঁদো কেঁদো মাকড়সা খাপ

পেতে রেয়েছে। ছাদের উপর টিকটিকিরা খচমচ করে চলাফেরা করছে। তারা অনেক দিন পায়ের নখ কাটেনি। বড় বয়ামের পাশে ওটা কী? নিশ্চয় আমতেল, কেটে পড়ার চেষ্টায় আছে। তুলে দেখে— এ মা! আম তো নয়, আরশুলা চ্যাপটা! যেই পেন্টেলুনে হাতটা মুছতে যাবে— এই রে, পিসিমা! ঘোতনের আত্মারাম শুকিয়ে জুতোর সুখতলার মতন হয়ে গেল, হাত-পাগুলো পেটের ভিতর সেঁদিয়ে গেল।

পিসিমা বললেন, 'দরজার কাছে হাওয়া আটকে দাঁড়ালে আচার ভেপসে উঠবে।' ঘোতন ভয়ের চোটে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিল, পিসিমা আবার ডেকে বললেন, 'আচার নিয়ে যাও।'

পিসিমা যে কী! বকলেও বিপদে ফেলেন, না বকলেও বিপদে ফেলেন। ঠেঙিয়েও হার মানান, আবার না ঠেঙিয়েও হার মানান। অন্য বুড়োদের মতন একটুও না।

ঘোতনের ভারি লজ্জা করল।

দিন-দুপুরে

দুপুর বেলা বাড়িসুদ্ধ সব্বাই ঘুমোচ্ছে। বাবা ঘুমোচ্ছেন, মা ঘুমোচ্ছেন, মেজোমামা পর্যন্ত খবরের কাগজে মুখ ঢাকা দিয়ে বেজায় ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু টুনুর আর ঘুমই আসে না। তাকিয়ে দেখল হাবুটা অবধি চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে আছে। তাকে ডাকা চলে না মেজোমামা যদি জেগে যান!

টুনু শুয়ে শুয়ে ভাবছে বাবার নতুন ঘোড়া খুব সুন্দর হলেও দাদামশাইয়ের বুড়ো ঘোড়া লালুর কাছে লাগে না। লালু কত কালের পুরোনো, সেই কবে মেজোমামা যখন ইস্কুলে যেতেন তখনকার! কীরকম প্রভুভক্ত! ওর গায়ে কী জোর! ভাবতে ভাবতে টুনুর মনে হল— বাদলা দিন বলে বাবা আবার আজ ঘোড়ায় চড়তে বারণ করেছেন। বড়োদের যদি কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে। আচ্ছা, আজকের দিনই যদি ঘোড়া না চড়বে, তো চড়বে কবে!

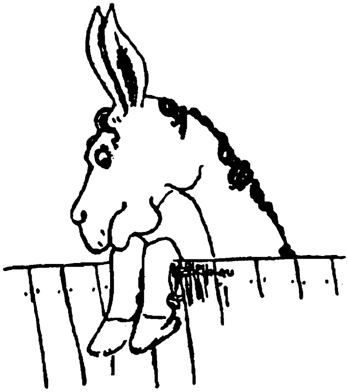

জানলা দিয়ে বাইরে তাকাতেই টুনুর মুখটা হাঁ হয়ে গেল, চোখ দুটো গোলমাল হয়ে গেল। দেখল দাদামশাইয়ের বুড়ো ঘোড়া লালু কেমন যেন মুচকি হাসতে হাসতে উঠোন পার হয়ে বাবার নতুন ঘোড়া রতনের আস্তাবলে ঢুকল। টুনু উঠে এসে জানলার আড়ালে দাঁড়াল। একটু বাদেই রতন লালু দু-জনেই আস্তাবলের কোণ ঘুরে কোথায় যেন চলে গেল।

টুনু ডাকল— 'ও কেশরী, ও সই-ই-স! লালু-রতন যে পালিয়ে গেল!' কিন্তু গলা দিয়ে আর স্বরই বেরুল না। বাইরে এসে ইদিক-উদিক তাকিয়ে যখন কেশরী সিং কিম্বা সইসের পাত্তা পেল না, টুনু নিজেই চলল আস্তাবলের কোণ ঘুরে রতন-লালুর পিছন পিছন।

কী আশ্চর্য! আস্তাবলের পিছনে সেইসব ধোপাদের কুঁড়ে ঘর, তার সামনে নোংরা মাঠে ধোপাদের গাধা বাঁধা থাকত, আর ময়লা দড়িতে সাহেবদের কোট পেন্টেলুন রোদে শুকুত, সেইসব গেল কোথায়? টুনু দেখল দু-পাশে গা ঘেঁষে ঘেঁষে সারি সারি দোকান। কোনোটা আলু কাবলির, কোনোটা লাল-নীল পেনসিলের, কোনোটা কাচের মার্বেলের। চারিদিকে দোকানে দোকানে বড়ো বড়ো নোটিস ঝোলানো।—

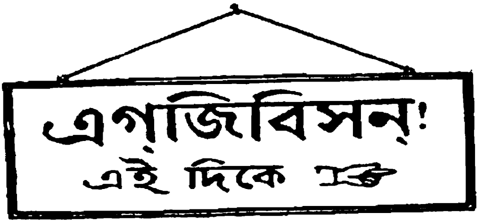

আর একটা দাড়িমুখো মোটকা বুড়ো একটা ফুটো বালতি পিটোচ্ছে আর ষাঁড়ের মতন গলায় চ্যাঁচাচ্ছে— 'পয়সা না ফেলেই ঢুকে যান! পয়সা-টয়সা কিচ্ছু চাই না, গেলেই বাঁচি!'

টুনু আরও এগ্‌জিবিশন দেখেছিল, কতরকম আশ্চর্য জিনিস থাকে সেখানেঃ দোকান, বাতিওয়ালা থাম, বায়স্কোপ, নাগরদোলা, গোলকধাঁধা!

তাই টুনু তাড়াতাড়ি চলল, মাঝপথে একটা ষণ্ডামার্কা লোক পথ আগলে বলল, 'এইয়ো!' টুনু তাকে দেখতেই পেল না, পায়ের ফাঁক দিয়ে সুট্ করে গলে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ একটা মস্ত খোলা জায়গায় উপস্থিত হল, তার যেদিকে তাকায় কেবল ঘোড়া! বড়ো ঘোড়া, ছোটো ঘোড়া, সাহেবের ঘোড়া, গাড়োয়ানের ঘোড়া, ভালো ঘোড়া, বিশ্রী ঘোড়া। আবার একটা মড়াখেকো হলদে ঘোড়া, ওলটানো টবে চড়ে গ্যাঁস্‌গেঁসে গলায় বক্তৃতা দিচ্ছে :

'হে ব্যাকুল ঘোড়াভাই-ভগিনী, আজ আপনারা কীসের জন্য এখানে আসিয়াছেন? পুরাকালে আপনারা বন-বাদাড়ে সুখে বিচরণ করিতেন, এই দুষ্ট মানুষগুলাই তো আপনাদের পাকড়াও করিয়া বিশ্রী গাড়িতে জুতিয়াছে। পায়ে নাল বাঁধাইয়া, পিঠে জিন চড়াইয়া, দুই পাশে অভদ্রভাবে ঠ্যাং ঝুলাইয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। ছিঃ! ছিঃ! আপনারা কী করিয়া এই দু-পেয়েদের কুৎসিত চেহারা সহ্য করেন?'

পিছন থেকে গাড়োয়ানদের ছোটো ছোটো ঘোড়াগুলো চেঁচিয়ে উঠল, 'কক্ষনো সইব না! সইব না! সইব না! মিটিং করে, রেজলিউশন করে, দানা না খেয়ে মানুষদের জব্দ করব!'

হলদে ঘোড়া ঠ্যাং তুলে ওদের চুপ করিয়ে দিল, টুনুর মনে হল সে নিজের ছাড়া আর কারুর গলার আওয়াজ সইতে পারে না।

এক কোণে লালু রতন দাঁড়িয়েছিল, হলদে ঘোড়া হঠাৎ লালুকে বলল, 'আপনি প্রবীণ ব্যক্তি! আপনি কিছু বলুন।' বলবামাত্র লালু তড়্‌বড়্ করে টব থেকে তাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বিনা ভূমিকায় আরম্ভ করলে :

'বহুকাল ধরে আমি চৌধুরিদের বাড়িতে থাকি। তাদের মতন ছোটোলোক আর জগতে নেই—' টুনুর শুনে ভারী দুঃখ হল। 'তার ওপর তারা এমন নিরেট মুখ্যু যে বড়োবাবু পর্যন্ত সামান্য— যাক আমি কখনো কারো নিন্দে করি না। ওদের বাড়ির ছেলেগুলো আহাম্মুকের একশেষ। আমি শিক্ষা দেবার জন্য ইচ্ছে করে ওদের কাপড় রোদে দিলে মাড়িয়ে দিই, জানলা দিয়ে ঘরে মুখ বাড়াই, বোকারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে চিনি খেতে দেয়, আর কেউ যখন দেখছে না গিন্নির হিসেবের খাতা চিবিয়ে রাখি। তা ছাড়া নোংরা জিব দিয়ে ওদের সইসের মুখ চেটে দিই, ছোটো ছেলে একা পেলেই তেড়ে গিয়ে পা মাড়িয়ে দিই, এইরকম নানা উপায়ে জাতির মান রক্ষা করি।

'সবচেয়ে বিশ্রী ওদের টুনু আর হাবু বলে দুটো পোষা বাঁদর। অমন বদ চেহারার বাঁদর কেউ যে পোষে জানতাম না। ওরা আমাদের ঘুমের সময়ে এসে ঘেমো হাতে উলটো করে আমাদের গায়ে হাত বুলোয়, এমন ঘেন্না করে যে কী বলব! আবার পাতায় করে যত অখাদ্য জিনিস এনে গদগদ

হয়ে শুয়োরের মতো ছুঁচলো মুখ করে, চুক্‌চুক্‌ শব্দ করে খাওয়াতে চেষ্টা করে— ইচ্ছে করে দিই ছেঁচে! কিন্তু অমন নিকৃষ্ট জীবকে মারতেও ঘেন্না করে।'

টুনু বিশ্বাসঘাতক লালুর কথায় অবাক হয়ে গেল, এমন অকৃতজ্ঞতা দেখে তার বড্ড কান্না পেল! ছি, লালুর জন্য দাদামশাই ভালো দানা আনান— সে কথা কই লালু তো বলল না! রতনের নতুন জিনের কথাও বোধ করি সে, ভুলে গেছে! টুনু প্রতিজ্ঞা করল আর কখনো আস্তাবলের দিকে যাবে না, ঘোড়া চড়তেও সে চাইবে না। লালুকে সে কত ভালোবাসে আর লালুর তাকে নিকৃষ্ট বলে মারতেও ঘেন্না করে! টুনু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেই চমকে দেখল, সে কখন জানি মেজোমামার ঘরে এসে শুয়ে রয়েছে আর লালুটাও ইতিমধ্যে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মেজোমামার হাত থেকে চিনি খাচ্ছে!

টুনুর বড্ড রাগ হল, ডেকে বলল, 'দিয়ো না ওকে মেজোমামা, ও বলেছে আমরা আহাম্মুক ছোটোলোক, নিকৃষ্ট বলে মারতেও ঘেন্না করে!' মেজোমামা 'আহাঃ!' বলে টুনুকে চুপ করিয়ে দিয়ে একমনে চিনি খাওয়াতে লাগলেন। টুনু হাঁ করে দেখল লালু দিব্যি চিনি সাবাড় করল, কিন্তু যাবার সময় মনে হল চোখ টিপে জিব বের করে বিশ্রী ভেংচে গেল! কিন্তু সে কথা কাকেই-বা বলে।

ক্যাবলাকান্ত

ক্যাবলাদের বাড়ির পুকুরে কোথায় এক গোপন জায়গায় সেই লাল-নীল মাছটা ডিম দিয়েছিল।— জানত শুধু লাল-নীল মাছ আর শংকর মালী। ব্যাঙেরা তাকে খুঁজে পায়নি। হাঁসরা তাকে খুঁজে পায়নি। ক্যাবলা যেদিন শংকর মালীর কাছে খবর পেল সেই দিনই পুকুরপাড়ে ছুটে গিয়েছিল কিন্তু সেও খুঁজে পায়নি। দেখল ব্যাঙরা ডিম খুঁজে খুঁজে পুকুরের নীল জল ঘুঁটে ঘোলাটে করে দিয়েছে, হাঁসরা পদ্ম ফুলের মধ্যে প্যাতপেতে চামড়াওয়ালা ঠ্যাং চালিয়ে শেকড়-বাকল পর্যন্ত তুলে এনেছে, কিন্তু ডিমের কোনো পাত্তাই নেই।

বুড়ো হাঁসখুড়ো বলেছিলেন— 'চোখ রাখিস, তা দেবার সময়ে ক্যাঁক করে ধরিস।' কিন্তু সকাল-সন্ধ্যে লাল-নীল মাছটাকে গোমড়া মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল, তা দেবার নামটি করলে না। সারা দুপুর মাছটা এখানে এক কামড় শেকড়, ওখানে দুটো কীসের দানা খেয়ে বেড়াল, তা দেবার গরজই নেই!

হাঁসরা তো রেগে কাঁই! 'আরে মশাই, আমরা ডিম দিলে ভর-সন্ধে তার ওপর চেপে বসে থাকি। ত্রিসীমানায় কেউ এলে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে যাই, আর এ দেখি দিব্যি আছে!'

ব্যাঙরা তাগ করে থেকে থেকে শেষটা ঝিমিয়ে এল। হাঁসরা ম্যাদা মেরে গেল, ক্যাবলাও দু-তিন দিন ঘুরে গেল।

শংকর মালীকে অনেক পেড়াপীড়ি করাতে সে বললে— 'অ রাম-অ! সে বলিবাকু বারণ-অ অছি!'

ক্যাবলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, লাল-নীল মাছটা ছোটো ছোটো ডানি-ওয়ালা পোকা ধরে ধরে কপাকপ গিলছে দেখল। কী মোটকা মাছ বাবা। পাঁজরের একটা হাড় গোনা যায় না।

ক্যাবলার একটু দুঃখও হল, পগারের মধ্যিখানে কে জানে কোথায় ডিম ফেলে লোকটা দিব্যি মাকড়গুলো মেরে খাচ্ছে। কাল হোক, পরশু হোক, যেদিনই হোক, মেজোমামার মস্ত ছিপটা এনে এটাকে ধরবেই ধরবে। বামুনদিদিকে দিয়ে দেবে, ঝোল রেঁধে খাবে, কাঁটাগুলো বিল্লিকে খাওয়াবে।

এ তো গেল ক্যাবলার কথা। এদিকে লাল-নীল মাছটার ভাবগতিক দেখে পুকুরের আর সবার গা জ্বলছে। শংকর মালী ভাত দিলেই ও তেড়েমেড়ে আগেভাগে গিয়ে সব সাফাই করে দেয়। হাঁসরা সময়মতো উপস্থিতই হতে পারে না, ব্যাঙরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললে, তবু সে গ্রাহ্যই করে না।

শেষটা একদিন চাঁদনি রাতে লাল-নীল মাছের ডিম ফুটে ছোটো একটা ছানা বেরুল। শংকর মালী জানত তাই দেখতে পেল কিন্তু কাউকে কিছু বলল না। আর ক্যাবলা তো ছিপই পায় না, মেজোমামা সেটাকে ডাল-কুত্তোর মতন পাহারা দেন।

ছোটো ছোটো দাঁতের দাগ কারো চোখেই পড়ল না। ব্যাঙাচিগুলোকে কে যে একা পেলেই ভয় দেখায়, ব্যাঙাচি বেচারাদের বোল ফোটেনি, তারা বলতে পারল না, তারা কেবল দিন দিন ভয়ের চোটে আমসির মতন শুকিয়ে যেতে লাগল। তাদের ল্যাজগুলো খসে যাবার অনেক আগেই নারকোল-দড়ি হয়ে গেল।

এমনি করে আরও ক-দিন গেল। তারপর বিকেল বেলায় ক্যাবলা ছিপ ছাড়াই পুকুর পাড়ে চলল। পথে দেখল ওদের তাল গাছ থেকে সর সর করে কী একটা যেন নামছে, তার ঠ্যাং দুটো দড়ি দিয়ে একসঙ্গে বাঁধা, পাঁচু ধোপার গাধার মতন, তার কোমরে দুটো হাঁড়ি ঝোলানো। ক্যাবলা ভাবছিল লোকটাকে দেখে সুবিধের মনে হচ্ছে না, সট্‌কান দেবে কি না ভাবছে, এমন সময় লোকটা তাকে ডাকল।

ক্যাবলা দেখল হাঁড়ির ভিতর সাদা ফেনা, তার গন্ধের চোটে ভূত ভাগে। লোকটা ক্যাবলার সঙ্গে অনেক কথা বললে, লাল-নীল মাছের কথা শুনে, কেমন যেন ভাবুক ভাবুক হয়ে গেল। বললে ছিপের কী দরকার? ছোটোবেলায় তারা নাকি কাপড় দিয়ে কচি কচি মাছ ধরত। এখনও ছুটির দিনে সাঁওতালরা দল বেঁধে কোপাই নদীতে মাছ ধরে। তাদের ছিপ নেই, মাঝখানে ফুটো ধামার মতন জিনিস দিয়ে গপাক্ গপাক্ চাপা দিয়ে ধরে। কাছাড়ের কাছে কোথায় পাহাড়ি নদীতে রাত্রে নাকি জাল বেঁধে রাখে এপার থেকে ওপার, সকালে দেখে তাতে কত মাছ, ছোটোগুলো ছেড়ে দেয় আর বড়োগুলো ধরে নিয়ে যায়।

লোকটা এমনি কত কী বলল। যাবার সময়ে বলে গেল হাঁড়ির কথা যেন কাউকে না বলে।

সে চলে গেলে ক্যাবলা কাপড়ের খুঁট বাগিয়ে ঘটম্যাক ঘটম্যাক করে জলের দিকে চলল। আজ মাছ ব্যাটাকে কে রক্ষা করে?

এমন সময় টুপ করে জল থেকে মাছের ছানা মুণ্ডু বের করে বিষম এক ভেংচি কাটল। ওরে—বাবারে, সে কী মেছো ভেংচি! ক্যাবলা তো শাঁই শাঁই ছুট লাগাল, আর হাঁসেরা ব্যাঙেরা কে যে কোথায় ভাগল তার পাত্তাই নেই!

সন্ধ্যে বেলা শংকর মালী যখন ওদের জন্য ভাত আনল, দেখল কেউ কোথাও নেই, খালি লাল-নীল মাছ আর সবুজ ছানা পাশাপাশি বসে ফ্যাচফ্যাচ করে হাসছে।

আপদ

আয়না দেখে আঁতকে উঠলুম। এ তো আমার সেই চিরকেলে চেহারা নয়! সেই যাকে ছোটোবেলা দেখেছিলুম, ন্যাড়া মাথা নাকে সর্দি, চোখ ফুলো! তারপর দেখেছিলুম চুল খোঁচা, নাক খাঁদা, গালেটালে কাজল! এই সেদিনও দেখলুম খাকি পেন্টেলুন, ময়লা শার্ট, মুখে কালি! এমনকী, আজ সকালেও দেখেছি কালো কোট, ঝাঁকড়া চুল, রাগী রাগী ভাব!

এই সেই চিরকেলে আমি নয়। দেখলুম বয়েসে ঢের, মুখভরা নোংরা ঘেমো কাঁচা-পাকা দাড়ি, ঝুলো ঝুলো গোঁফ, চোখে নীল চশমা, গলায় হলদে লাল ডোরাকাটা কম্ফর্টার, গায়ে গলাবন্ধ লম্বা কালো কোট, বুকের কাছে বোতাম নেই, মরচে-ধরা সেফটিপিন আঁটা। অবাক হয়ে গেলুম!

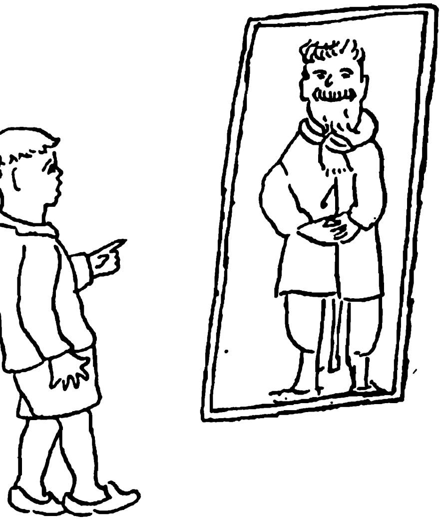

আয়নার পিছনে হাতড়ে দেখলুম কেউ যদি লুকিয়ে বসে থাকে। দেখলুম কেউ নেই, খালি কাঠের উপর আঙুলগুলো খচমচ করে উঠল, নখের মধ্যে খানিকটা বার্নিশ না ময়লা কী যেন ঢুকে গেল।

বিরক্ত লাগল।

গলা 'হহম' করে সাফ করে বললুম, 'কে?'

সেই লোকটা দাড়ি চুলকে মুচকি হেসে বলল, 'ন্যাকা! চেন না যেন!' বলে এক হাতে গোঁফ আঁচড়ে উপরে তুলে দিল, অন্য হাতে দাড়ি খামচে নীচে ঝুলিয়ে দিল। দেখলুম নীচে আমারই নাক-মুখ ঢাকাচাপা রয়েছে!

বললুম, 'য়্যাঁ!'

লোকটা সিড়ি না কী যেন বেয়ে তরতর করে খানিকটা উপরে উঠে গেল, চাপা গলায় বলল, 'বাকিটাও পছন্দ হল কি?' দেখলুম তার মুন্ডু দেখা যাচ্ছে না। তার জায়গায় নোংরা ধুতি হাঁটু অবধি, গোড়ালি-ছেঁড়া লাল মোজা গুটিয়ে নেমেছে; পাম্প-শুর ফাঁক দিয়ে বুড়ো আঙুল বেরিয়েছে, নখগুলো আঁকাবাঁকা মাংসে ঢাকা।

ব্যাপারটা কোনোদিক দিয়ে সুবিধে বুঝলুম না। মুন্ডু ফিরিয়ে চলে গেলুম। যাবার আগে বাতি নিবিয়ে ছায়াটাকে নিকেশ করে দিলুম। তবু মনে হল আয়নার ভিতর বুনো অন্ধকার থেকে কে যেন বুড়ো মানুষ হ্যাঃ হ্যাঃ করে বিশ্রী হাসি হেসে আনন্দ করছে। কী আর বলব! রাগলুম, ভয়ও পেলুম। খেতে গিয়ে মনে হল সবাই যেন একটু অন্যরকম করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মনে হল যেন সুবিধে পেলেই সব ক-টা গোঁফের ফাঁকে ফ্যাচ ফ্যাচ করে হেসে নিচ্ছে। যেন সেই বুড়ো লোকটার কথা আর গোপন নেই, সবাই জেনে ফেলে আমোদ করছে!

খাবারগুলো বদ লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লুম। তবু রক্ষে নেই। যেখানে যাই কে যেন নীল চশমা পরে সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভালো করে লক্ষ করলুম, কানে তার পাকা লোম, শোনবার সময়ে খাড়া হয়ে ওঠে। একবার জোর করে বললুম, 'এইয়ো। আমি অন্য লোক। তুই কে রে?' বলতেই সে কোথায় মিশিয়ে গেল। শার্টের গলার চারপাশে আঙুল চালিয়ে তাগড়া হয়ে নিলুম।

এমন সময় গঙ্গুদা বলল, 'এদিকে আয়।'

গেলুম— বাপরে, না গিয়ে উপায় আছে? ও বাপু ভীষণ লোক। মুখে দাড়ি, রোগা শরীর, বাবাজিদের সঙ্গে ভাব। সাদা শিমুলের শেকড় খাইয়ে নাকি পড়া দাঁত গজিয়ে দিতে পারে। দেখলুম সে চোখ পাকিয়ে পায়ের পাতা উলটে, সটাং হয়ে খাটে বসে দুই হাঁটুতে হাত বুলুচ্ছে, মুখে একটা খিদে খিদে ভাব। বললে, 'ঘাড়ে সুড়সুড়ি দে।' ভাবলুম বলি, 'এখন পারব না।' কিন্তু সে এমন কটমট করে চেয়ে বললে—

ও পারে যেও না ভাই, ফটিংটিঙের ভয়,
তিন মিনসের মাথা কাটা, পায়ে কথা কয়।
তাদের সঙ্গেতে মোর চেনাশোনা আছে রে,
সুড়সুড়ি না দিস যদি বিপদ ঘটতে পারে রে।

দেড়টি ঘণ্টা সে গুনগুন করে গাইতে লাগল—

কেরোসিন! কেরোসিন!
কেরোসিনের সুবাতাসে
মহাপ্রাণী খইসে আসে,
খাও, খাও, ভইরে টিন,
কেরোসিন! কেরোসিন!

রেগে ভাবলুম দিই ব্যাটার ঘাড়ে চিমটি। সে আরও গাইলে—

অনুতাপে দগ্ধ হবি,
ড্যাও দুদু চেটে খাবি।

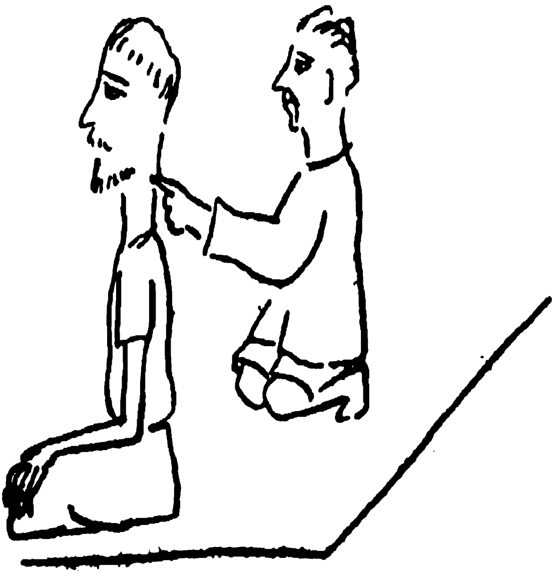

জিজ্ঞেস করলুম, 'ড্যাও দুদু কী?'
বললে, 'ড্যাও পিঁপড়ের দুধ। দে, সুড়সুড়ি দে, অত খবরে কাজ কী?'

খানিক পরে আয়নার সামনে দিয়ে যাচ্ছি, দেখলুম আবার সেই লোকটা। এবার আবার মাথায় মাঙ্কি ক্যাপ। বড়ো কান্না পেল। বললুম, 'এমনিই তো যথেষ্ট ছিল, আবার ওটা কেন?'

সে বললে, 'ছ্যাঃ। গঙ্গুদাকে ভয় পাও, আবার কথা! দু-কানে যে তুলো গুঁজিনি সে তোমার ভাগ্যি আর আমি দয়ালু বলে। ছ্যাঃ, এত প্রাণের ভয়!'

আবার বললুম, 'একটু আগে তো অমন ছিল না। ওটা খুলে ফেলুন বড়ো বদ, বড়ো বদ।'

সে বললে, 'তাপ্পর অনেক জল বয়ে গেছে, অনেক জিনিস অদল-বদল হয়ে গেছে। আর চল্লিশটা বছর সবুর করো, এই এমনটিই হবে। ছ্যাঃ! গঙ্গুটাকে মানুষ হতে দেখলুম, তাকে ভয় পায়! আরে তার দাঁত পড়তে ক্যায়সা চেঁচিয়েছিল আজও মনে আছে।' চোখ পিট পিট করে বললুম, 'আপনি বুড়ো মানুষ, আর কি বেশি বাঁচবেন!'

লোকটা চকাত চকাত করে হেসে বলল, 'ফ্যাচর! ফ্যাচর! সেই আনন্দেই থাকো! বুঝলে না হে? আমিই হচ্ছি তুমি। তুমি যেমন ভীতু, কাপুরুষ, হাঁদা, বুড়ো হলে আমার মতন সাবধান-সাবধান গোছের হবে। তাই তো আমার রাগ ধরে। ইচ্ছে করলেই লক্ষ্মী ডাক্তারের মতন হতে পার।

হাফপ্যান্ট আর মাদ্রাজি চটি পরে ফলমূল খেয়ে তেজি-তেজি ভাবে ঘুরে বেড়াতে পার। তা নয়! আরে ছোঁড়া, ওই তো টিকটিকির মতন শরীর, ছারপোকার মতন মন! অত ভয় কীসের? এতে অসুখ করবে, ওতে বকুনি খাব, অত ভাবনা কেন? কর আরও, আর এইরকম চেহারা হবে। আজ মাঙ্কি ক্যাপ, কাল মাথায় কম্বল মুড়ি। আরে হতভাগা তোর মতো একটা অপদার্থ মলেই-বা কী?'

এই অবধি শুনে এমন রাগ হল যে ঠাস করে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম।

তাতে এক আশ্চর্য কাণ্ড হল।

চড়ের চোটে গাল ঘুরে গেল। দেখি ওমা! সে লক্ষ্মী ডাক্তার হয়ে গেছে! একগাল হেসে সেলাম ঠুকে বললে, 'সাবাস বেটা! এই তো চাই।' বলেই কোথায় মিলিয়ে গেল। আর তাকে দেখিনি। কিন্তু তারপর থেকেই লোকে আমায় বলে: 'তেজি বুড়ো'।

চোর ধরা

নন্দর আজ বেজায় মন খারাপ। সেই সকাল থেকে সব জিনিসকে কীসে যেন পেয়েছে! ঘুম থেকে উঠেই ভোঁদাকে ঠ্যাঙাতে গিয়ে অত ভালো হকি স্টিকটার হ্যান্ডেলের সুতো কতখানি এল খুলে! তায় আবার ভোঁদা হতভাগা এমনি চেঁচাল যে বড়োমামা এসে নন্দর কান পেঁচিয়ে মাথায় খটাং খটাং করে দুই গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন।

তারপর, সেই দেয়ালে কাজলকালি দিয়ে কুকুর তাড়া করছে, মোটা লোকটার ছবি আঁকবার জন্যে বাবা মন্টুর সঙ্গে সেই চমৎকার জায়গায় সেই মজার জিনিস দেখতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। নন্দ আর কী বলে! ছি, মন্টুই-বা কী ভাবল বলো তো? নাঃ! বুড়োরা যে কেন পৃথিবীতে জন্মায় বোঝা যায় না!

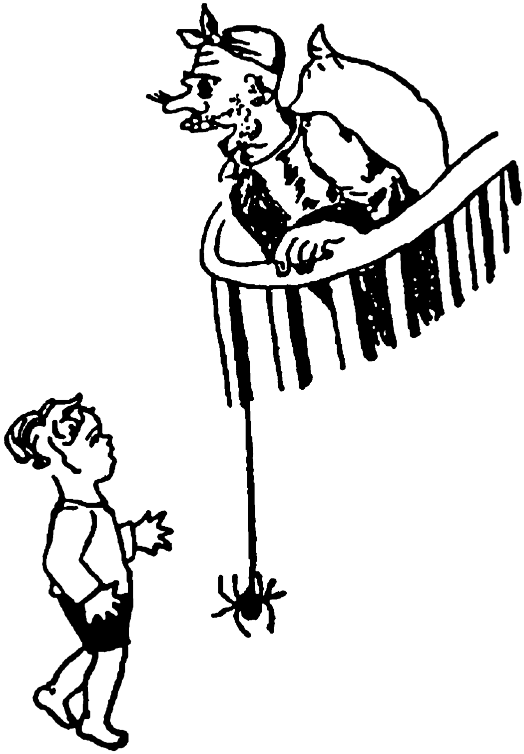

আচ্ছা, অন্যদের বাড়ির লোকেরাও কি এমন হাঁদা? এরা কি— চ্ছু বোঝে না। এই তো কালই দিদির নাগরাইয়ের শুঁড় পাকিয়ে দেবার জন্য দিদি চাঁটাল। আচ্ছা, শুঁড় পাকিয়ে কী এমন খারাপটা দেখাচ্ছিল? ভারি তো নাগরাই! এর চেয়ে আর কোথাও চলে যাওয়া ভালো— ইজিপ্টে যেখানে নীল নদীর ধারে ফ্লেমিংগো পাখিরা মাছ ধরে খায়, আর মস্ত মস্ত কুমিররা বালির উপর রোদ পোহায়। নয় তো মানস সরোবরে যেখানে

এক-শো বছরে একটা নীল পদ্মফুল ফোটে। সেজদা বলেছে, কাগজে আছে কারা নাকি ছোটো ছোটো ঘোড়ার পিঠে বোঁচকা বেঁধে, টিনের দুধ, বিস্কুট, কম্বল-টম্বল নিয়ে সেখানে যাচ্ছে।

কিংবা তাদের ছেড়ে নন্দ আরও উপরে যাবে, যেখানে লোমওয়ালা মানুষরা কীসের জানি রস খায়, সে খেলেই গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কিংবা— যাবার তো কত জায়গাই আছে!

খিদিরপুরের ডকেই যদি কাজ নেয় কে খুঁজে পাবে! সেই যে একবার নন্দ দেখেছিল, একটা পুলের তলায় ইঁট দিয়ে উনুন বানিয়ে মাটির হাঁড়িতে কী রেঁধে খাচ্ছিল কারা সব, ডকের কুলি হবেও-বা। সেইরকম করে থাকবে। কিংবা যারা গান করে করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের সঙ্গেও তো জুটে যাওয়া যায়। গোরুর গাড়ি নিয়ে মেলাতে মেলাতে বেড়ানো যাবে। কিন্তু তার আবার একটা অসুবিধে আছে। দিদিকে গান শেখাতে এসে গোপেশ্বরবাবু বলে গেছেন, কোকিলের ডিম ভেঙে খেলেও এ ছেলের কিছু হবে না।

গান করতে না পারুক, গোরুর গাড়ি তো চালাতে পারবে! হঠাৎ একটা ভীষণ সংকল্প করে নন্দ সটান উঠে একেবারে ঘোরানো সিঁড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

মা বলেছেন, 'খবরদার ও দরজা খুলবি নি। বিপদে পড়বি।' কী বিপদ অনেক ভেবে নন্দ মাসিমাকে জিজ্ঞেস করেছিল। মাসিমা বলেছিলেন, 'ওরে বাবা! সে ভীষণ বিপদ!'

'কী ভীষণ?' জিজ্ঞেস করাতে আবার বললেন, 'সিঁড়ির মোড়ে মোড়ে বেজায় হিংস্র লোকেরা নাকি বাঁকা ছুরি হাতে চকচকে চোখ করে ওত পেতে আছে সারা রাত, ভোর বেলা গঙ্গায় জাহাজের বাঁশিগুলো যেই বেজে ওঠে ওরাও কোথায় আবছায়াতে চলে যায়।' নন্দ জানতে চাইল তারা কোত্থেকে এসেছে। মাসিমা বললেন, 'কেউ এসেছে জাভা থেকে, কেউ সান্‌ফ্রানসিস্কো, কেউ কাম্বোডিয়া থেকে। আউটরাম ঘাটের কাছে তাদের জাহাজ নোঙর দেওয়া আছে, জাহাজের পাশের রেলিং না-দেওয়া সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে রাত দুপুরে নেমে এসেছে, ভোর না হতেই আবার ফিরে গিয়ে জাহাজের নীচে অন্ধকার ঘরে প্রকাণ্ড উনুনে কয়লা পুরবে।'

একবার অনেক রাতে নন্দ কোথা থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ঘরে ফিরছিল। তখন নিজের চোখে দেখেছিল ছোটো ছোটো টিমটিমে আলো নিয়ে কারা যেন ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করছে। তাই দরজার সামনে এসে নন্দ একবার থামল। বেশ রাত হয়েছে, বাইরে খুব হাওয়া দিচ্ছে, কেমন অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে। হাওয়া তো রোজই দেয় আজকাল, কিন্তু এ-রকম তো কখনো মনে হয় না।

নন্দ দরজা খুলল, চামচিকের খোকার কান্নার মতন একটা শব্দ হল। একটা বড়ো সাইজের ঠ্যাঙে লোমওয়ালা মাকড়সা সড়সড় করে নন্দর পায়ের উপর দিয়ে চলে গেল।

প্রথম সিঁড়িতে পা দেবার আগে নন্দ উপর দিকে তাকাল, যতদূর দেখা যায় সিঁড়ি ঘুরে পাঁচ তলার ছাদ পর্যন্ত উঠেছে, আর নীচের দিকে যতদূর দেখা যায় ঘুরে ঘুরে এক তলার শানবাঁধানো গলি পর্যন্ত নেমেছে।

সিঁড়ির রেলিংটা ক্যাঁ-কোঁ করে নড়ে উঠল, কার জুতো জানি চাপাগলায় মচমচ করে উপর থেকে নেমে আসতে লাগল। নন্দর হাত-পা হিম হয়ে গেল, অন্ধকারে দেয়ালের গায়ে চ্যাপটা হয়ে টিকটিকির মতন লেগে রইল।

তারপর দেখল বুড়ো-আঙুল-বার-করা, জিভ-কাটা ছেঁড়া হলদে বুট-পায়ে, তালি-দেওয়া সুতো-ঝোলা লম্বা পেন্টেলুন-পরা দুটো ঠ্যাঙ সিঁড়ির বাঁক ঘুরে নামতে লাগল। তারপর দেখল,

পিঠে তার মস্ত ঝুলি, থুতনিতে খোঁচা দাড়ি, নাকের উপর আঁচিল, তার উপর তিনটে লোম, ন্যাড়া মাথায় নোংরা টুপি— বোঝ হয় সেই হিংস্র লোকদের কেউ একজন! ভয়ের চোটে নন্দর একপাটি চটি ছিটকে খুলে, ঠংঠং করে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নীচে চলল, আর সেই হলদে বুটপরা হিংস্র লোকটা থতমত খেয়ে বোঁচকা ফেলে দে ছুট!

নন্দর কিন্তু আর কিচ্ছু মনে নেই। কেমন ভেড়ু বানিয়ে গিয়েছিল! লোকটা কিন্তু নিজেই টেনে কোথায় দৌড় লাগাল!

এদিকেপাঁচ তলার লোকেরা আজও গল্প করে নন্দ নামে একটি ছোটো ছেলে চোর ভাগিয়ে জিনিস বাঁচিয়েছিল।

শুনে শুনে নন্দ মনে ভাবে— বুড়োরা কী হাঁদা! কিন্তু বাইরে কিচ্ছু বলে না, চালাক কিনা!

নটবরের কারসাজি

সেই ছেলেটা প্রথম যেদিন মাস্টারমশাইয়ের পিছন পিছন ক্লাসে ঢুকল, গায়ে নীল ডোরাকাটা গলাবন্ধ কোট আর খাকি হাফ-প্যান্ট, চুলগুলো লম্বা হয়ে নোটানোটা কানের উপর ঝুলে পড়েছে, তেল-চুকচুকে আহ্লাদে আহ্লাদে বোকামতন ভাবখানা— দেখেই আমার গায়ে জ্বর এল। আবার আমোদও লাগল, একে নিয়ে বেশ একটু রগড় করা যাবে মনে ক'রে।

ছেলেটার পায়ে ফিতে-দেওয়া কালো জুতো একটু কিচকিচ করছিল, তাইতে নগা তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'জুতোর দামটা বুঝি আসছে মাসে দেওয়া হবে।'

ছেলেটা কিন্তু কিছু না বলে খাতা-পেনসিল নিয়ে থার্ড বেঞ্চে গিয়ে চুপ করে বসল। মাস্টারমশাই বললেন, 'ওহে নটবরচন্দ্র, বছরের মাঝখানে এয়েচ, ভালো করে পড়াশোনা কোরো।' নাম শুনে আমরা তো হেসেই কুটোপাটি, নগা তক্ষুনি তার নাম দিয়ে ফেলল— 'লটবহর'। সত্যি নগার মতন রসিক ছেলে খুঁজে পাওয়া দায়!

টিফিনের সময় নটবরচন্দ্র একটা ছোট্ট বইয়ের মতন টিনের বাক্স খুলে লুচি আলুরদম খেয়ে, হাত চাটতে চাটতে বার বার আমাদের দিকে তাকাতে লাগল। তাই-না দেখে নগা বললে, 'কী রে ছোঁড়া, মানুষ দেখে বুঝি অভ্যেস নেই?'

আমরা তাগ করেছিলাম, চটেমটে ছেলেটা কী করে দেখব। ছেলেটা কিন্তু খানিক চুপ করে থেকে হঠাৎ মুখে হাত দিয়ে বিশ্রী রকম ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে লাগল। নগা রেগে বলল— 'অত হাসির কথা কী হল শুনতে পারি?'

ছেলেটা অমনি নরম সুরে বলল— 'কিছু মনে কোরো না ভাই, সত্যি আমার হাসা উচিত হয়নি, কিন্তু তোমাদের দেখে আমার হঠাৎ মেজোমামার পোষা বাঁদরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। কেবল ওই ওকে ছাড়া'— বলে আমাকে দেখিয়ে দিল।

নগারা রেগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল, আমি কিন্তু একটু খুশি না হয়ে পারলাম না, অল্প হেসে জিজ্ঞেস করলাম— 'আর আমাকে দেখে কীসের কথা মনে হচ্ছে?'

সে অম্লানবদনে বললে— 'মূলতানি গোরুর কথা।' ভীষণ রাগ হল। ভাবলাম ছোটোবেলা থেকে এই যে শ্যামবাবুর কাছে স্যান্ডো শিখেছি সে কি মিছিমিছি! তেড়ে গিয়ে এইসা এক প্যাঁচ কষে দেবার চেষ্টা করলাম যে কী বলব! সে কিন্তু কী একটা ছোটোলোকি কায়দা করে এক সেকেন্ডে আমাকে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিল। ঠিক তক্ষুনি ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল, নইলে তাকে বিষম সাজা দিতাম।

ক্লাসের পর বাড়ি যাবার পথে তার জন্য ওত পেতে রইলাম, আমি আর একটা ছেলে। দেখা হতেই সে হাসিমুখে বলল, 'কী হে, চীনাবাদাম খেতে আপত্তি আছে?' আমরা আর কী করি একেবারে তো আর অভদ্র হতে পারি না, তাই চীনাবাদাম নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বললাম— 'দেখ্, নতুন ছেলে এসেছিস, নতুন ছেলের মতো থাকবি, আজ দয়া করে তোর চীনাবাদাম খেলুম বলে যেন মনে করিস না যে দুপুরের কথা ভুলে গেছি।'

সে বললে, 'রাগ কোরো না ভাই। আমি যদি জানতাম অমন হোঁতকা শরীর নিয়েও তুমি এমন ল্যাদাড়ে তবে কি আর কষ্ট করে জনসোনিয়ান প্যাঁচ লাগাতাম, এই এমনি দু-আঙুলে ধরে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিতাম।' এই বলে আমাকে কী একটা কায়দা করে চিতপাত করে দিয়ে নিমেষের মধ্যে সে তো হাওয়া! এর থেকেই বোঝা গেল সে কী ভীষণ ছেলে! সারারাত মাথা ঘামিয়েও তাকে জব্দ করবার উপায় দেখলুম না। পরদিন সকালে ছোটোমামা বলল, 'কী রে ভোঁদা, মুখ শুকনো কেন? পেট কামড়াচ্ছে বুঝি? রোজ বলি অত খাসনি।' যা বুদ্ধি এদের! বললুম— 'যে-বিষয়ে কিছু বোঝ না, সে-বিষয়ে কিছু বলতে এসো না।'

নটবরকে না পারতে পারি, তাই বলে যে অন্যদেরও এক কথায় চুপ করিয়ে দিতে পারি না, একথা যেন কেউ মনে না করে। হাবুটার কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। নিজের বেলা তো খুব বুদ্ধি খোলে, কিন্তু আমি যখন সব খুলে বলে পরামর্শ চাইলাম সে উলটে বললে, 'তুই আর তোর নগা না বগা, দু-টি মানিকজোড়! আমার কাছে যে বড়ো পরামর্শ চাইতে এসেছিস! ওরে ছোঁড়া, আগে পরামর্শ নেবার মতন একটু বুদ্ধি গজা!'

নাক সিঁটকে চলে এলুম। হ্যাঁ! পরামর্শ আবার কী! মেয়েদের সঙ্গে আবার পরামর্শ! জানে তো কেবল হি হি করে হাসতে আর কালো গায়ে লাল জামা চড়িয়ে সং সাজতে! সাধে কি মুনি-ঋষিরা ওদের বিষয়ে ওইসব লিখে গেছেন!

ইস্কুলে গিয়ে দেখি ছেলেটা আজ ফার্স্ট বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। একদিনেই দেখি মাস্টারদের বেশ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল! বোকার মতন মুখ করে থাকলে সবাই অমন পারে। আর বুঝি আন্দাজে আন্দাজে কতকগুলো সোজা সোজা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। পড়ত ওর ঘাড়ে আমাদের সব শক্ত শক্ত প্রশ্নগুলো, তবে দেখা যেত। যাই হোক, এক দিনেই নাম করবার তার এমন কিছু তাড়াহুড়ো ছিল না।

নগা বললে— 'ব্যাটা খোশামুদে!'

ছেলেটা শুনে বললে, 'ছিঃ, হিংসে করতে নেই, পরে কষ্ট পাবে।' রাগে নগা হাতের মুঠো খুব তাড়াতাড়ি খুলতে ও বন্ধ করতে লাগল। গেল বছর যদি ওর টাইফয়েড না হত নিশ্চয় সেদিন একটা কিছু হয়ে যেত।

এমনি করে কদ্দিন যেতে পারে! শেষটা একদিন গবুই এক বিষম ফন্দি বার করল। গবুটা দেখতে রোগাপটকা, আর প্রত্যেক পরীক্ষায়, প্রত্যেক বিষয়ে লাস্ট হলে কী হবে; ছেলেটার খুব বুদ্ধি আছে। সেদিন ক্লাসে এসেই সে নগাকে কানে কানে কী বলল। তাই-না শুনে উৎসাহের চোটে নগা অঙ্ক-টঙ্ক ভুল করে কোণে দাঁড়িয়ে একাকার! তাতে বরং একদিক দিয়ে সুবিধেই হল, নগা কোণে দাঁড়িয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে মতলবটা দিব্যি পাকিয়ে নিল।

সেইদিনই টিফিনের সময় নটবরকে ডেকে নগা বলল, 'ভাই নটবর, যা হবার তা হয়ে গেছে, একটা বড়ো দুর্ঘটনা ঘটেছে, হেডমাস্টারকে তাই একটু সাহায্য করা চাই। তুমি ক্লাসের ভালো ছেলে, তুমি বললে দেখাবেও ভালো, তা ছাড়া তোমার মতন গুছিয়ে কেই-বা বলতে পারবে?'

নটবর খুশি হয়ে বলল— 'তা তো বটেই! ক্লাসের অর্ধেক ছেলে তোতলা, আর বাকিগুলো একেবারে গবচন্দ্র।'

নগা আশ্চর্য রকমভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠান্ডা হয়ে বলল— 'তা, তুমি গিয়ে তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে বলবে যে তাঁর বাবার শ্রাদ্ধে তুমি কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে সাহায্য করতে চাও। এই একটু সম্মান দেখাবার জন্য আর কী! বুঝলে তো? ভালো করে বুঝিয়ে বোলো, এই কাল ওঁর বাবা মারা গেছেন কি না।'

নটবর হাঁ করে শুনে বলল— 'আহা, তাই নাকি? তোমরা ভেব না, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। তোমরা একটু অপেক্ষা করে থাকলে ফল টের পাবে।' বলে হেডমাস্টারের ঘরের দিকে চলে গেল। তার ওই 'টের পাওয়া'র কথাটা আমার ভালো লাগল না। 'টের পাওয়া' বলতে আমরা অন্য মানে বুঝি। সে যাই হোক গে। ক্লাসের ঘণ্টা পড়বামাত্র নটবর ছুটতে ছুটতে এসে বলল— 'হেডমাস্টার রাজি হয়েছেন। তোমাদের ক-জনকে এক্ষুনি ডেকেছেন কীসব কাজ বুঝিয়ে দেবার জন্য। তোমরা কী করে জানলে তাও জিজ্ঞেস করছিলেন। মনে হল খুব খুশি হয়েছেন। তোমরা এক্ষুনি যাও।'

আমরা প্রথম তো অবাক! শ্রাদ্ধের কথাটা গবুর সম্পূর্ণ বানানো। কোথায় নটবর ইয়ার্কি দেবার জন্য মার খাবে, না সত্যি হেডমাস্টারের বাপের শ্রাদ্ধ! এ-রকম কিন্তু আরও হয়। আমি একবার একটা অচেনা ছেলেকে মজা দেখবার জন্য বলেছিলাম, 'কী হে, চাটগাঁ থেকে কবে এলে?' সে বলল— 'কাল এলাম, তুমি কী করে জানলে?' আমি অবিশ্যি আর কিছু ভেঙে বলিনি।

যাই হোক, আমরা তো গেলাম। দেখলাম হেডমাস্টার গোমড়া মুখ করে ফার্স্ট ক্লাসের ছেলেদের ইংরেজি খাতায় লাল পেনসিলের দাগ কাটছেন। আমাদের দেখে খেঁকিয়ে বললেন— 'কী, ব্যাপার কী তোমাদের? ক্লাস নেই নাকি, এখানে যে বড়ো দঙ্গল বেঁধে এসেছ?'

নগা গলা পরিষ্কার করে বলল— 'আজ্ঞে, আপনার বাবার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছি। এই আমরা'— এইটুকু বলতেই হেডমাস্টারের এক ভীষণ পরিবর্তন হল। মুখটা লাল হয়ে বেগুনি হল, হাতের পেনসিলের মোটা সিস মট করে ভেঙে গেল, গোঁফ-চুল সব খাড়া হয়ে গেল, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল। তার চোটে শার্টের গলার বোতাম ফট করে ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। কীরকম একটা শব্দ করে আস্তে আস্তে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমরা এতক্ষণ হাঁ করে দেখছিলাম, এবার হঠাৎ একটা বিকট সন্দেহ হল। নটবর আগাগোড়া মিছে কথা বলেছে। হেডমাস্টার ডাকেননি। সে হয়তো দেখাই করেনি! হেডমাস্টার গর্জন করে উঠলেন, জানলার খড়খড়ি কেঁপে উঠল। আমরা ছিটকে বাইরে এসে পড়লাম, তিনি ফেলে দিলেন কী আমরাই পালিয়ে গেলাম, আজও ঠিক জানি না। কাঁপতে কাঁপতে ক্লাসে ঢুকেই শুনলাম, পণ্ডিতমশাই নটবরকে বলছেন, 'সে কী নটবর, হেডমাস্টারের ভাইপো তুমি, সেকথা অ্যাদ্দিন বলনি!'

নটবর বললে— 'বাবা বলেন ও সম্পর্কটা কিছু ঢাক পেটাবার মতো নয়। তা ছাড়া ইস্কুলটা বাজে। এইমাত্র কাকাকে সেই কথা বলে এলাম। তিনি তো রেগে কাঁই।'

এমন সময় দরোয়ান এসে বলল, 'গবুবাবু আর ভোঁদাবাবুকে বেত খেতে হেডমাস্টারবাবু ডাকছেন।'

তাই শুনে পণ্ডিতমশাইও বললেন— 'আর হ্যাঁ, বেত খেয়ে এসে আধ ঘণ্টা বেঞ্চে দাঁড়াবে, লেট করে ক্লাসে এসেছ।'

তাই বলি পৃথিবীটাই অসার!

গুপে

গুপে পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলে ফিরতে বড্ড সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমি আর গুপে দু-জনে অন্ধকার দিয়ে ফিরছি খেলার গল্প করতে করতে, এমন সময় গুপে বলল— 'ওই বাঁশঝাড়টা দেখছিস?' বললুম 'কই?' সে বললে, 'ওই যে হোথা। মনে হয় ওখানে কী একটা লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটেছিল, না?'

গুপের দিকে তাকালুম, এমন সময়ে এমন কথা আশা করিনি।

আমি বললুম, 'গুপে, তুই কিছু খেয়েছিস নাকি?'

গুপে বলল, 'চোখ থাকলেই দেখা যায়, কান থাকলেই শোনা যায়।' আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই। মাথা না থাকলে মাথা ব্যথা হবে কী করে?' গুপে বলল, 'তুই ঠিক আমার কথা বুঝলি না! দেখবি চল্ আমার সঙ্গে।'

বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। পেঁচোর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। সেও সন্ধেবেলা মাছ কিনে ফিরছে, বাঁশঝাড়ের পাশ দিয়ে আসছে, এমন সময় কানের কাছে শুনতে পেল, 'পেঁ-চোঁর মাঁ, মাঁছ দেঁ!' পেঁচোর মা হনহনিয়ে চলতে লাগল। কিন্তু সেও সঙ্গে চলল— 'দে বঁলছি, মাঁছ দেঁ!'

গুপে ক্লাসের লাস্ট বেঞ্চে বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা লোমহর্ষণ সিরিজের বিকট বই পড়ত। আমায় একটা দিয়েছিল, তার নাম 'তিব্বতি গুহার ভয়ংকর' কি ওই ধরনের একটা কিছু। আমায় বলেছিল, 'দেখ্, রাত্রে যখন সবাই ঘুমুবে, একা ঘরে পিদিম জ্বেলে পড়বি। দেয়ালে পিদিমের ছায়া নড়বে, ভারি গা শিরশির করবে, খুব মজা লাগবে।' আমি কিন্তু এক বার চেষ্টা করেই টের পেয়েছিলুম ও-রকম মজা আমার ধাতে সইবে না। আজ আবার এই!

গুপে বললে, 'কী ভাবছিস? চল্ দেখি গিয়ে। বাবার কে এক বন্ধু একবার দিল্লিতে একটা সেকেলে পুরোনো বাড়িতে একটা শুকনো মরা বুড়ি আর এক ঘড়া সোনা পেয়েছিলেন। দেখেই আসি-না। হয়তো গুপ্তধন পোঁতা আছে। যক্ষ পাহারা দিচ্ছে।' তারার আলোয় দেখলুম, তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলজ্বল করছে। তাই দেখেই আমার ভয় করতে লাগল— আবার বাঁশঝাড়ের যক্ষ!

কিন্তু কী করি, গুপেটা আঠালির মতন লেগে রইল। অগত্যা দু-জনে অন্ধকার ঘন ঝোপের মাঝ দিয়ে আস্তে আস্তে চললুম। গুপে আবার কী-একটা মস্তকহীন খুনির গল্প শুরু করল।

কবে নাকি কোন পুরোনো ডাকবাংলোয় কেউ রাত কাটাতে চাইত না। লোকে বলত, যারাই থেকেছে রাতারাতি মরে গেছে। কেউ কিছু ধরতে পারে না। বাবুর্চি বলে, 'হাম তো মুরগি পকাকে

আউর পরটা সেঁককে সাবকো খিলাকে ওই হামারা কোঠি চালা গিয়া। রাতমে কভি ইধার আতা নেই, বহুত গা ছমছম করতা, আউর যো সব কাণ্ড হোতা যো মালুম হোতা আলবত শয়তান আতা হ্যায়।'

শেষে কে-এক সাহসী, মস্ত এক কুকুর নিয়ে বন্দুকে গুলি ভরে বসে রইল, কী হয় দেখবে। কোথাও কিছু নেই, ঘর-দোর ঝাড়াপোঁছা পরিষ্কার। আশ্চর্য, দেয়ালে একটা টিকটিকি কী ঘুমন্ত মাছি অবধি নেই! অনেক যখন রাত, লোকটা আর জেগে থাকতে পারছে না, দেশলাই বের করছে, সিগরেট খাবে, কুকুরটাও ঝিমোচ্ছে, এমন সময় পাশের ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। সঙ্গেসঙ্গে আলোটাও কমে এল...

গল্প বলতে বলতে আমাদের চারিদিকের আলোও কমে এসেছিল, আর গুপের স্বর নীচু হতে হতে একেবারে ফিসফিসে দাঁড়িয়েছিল। আর তার চোখ দুটো আমার কপাল ছ্যাঁদা করে ভিতরের মগজগুলোকে ঠান্ডায় জমাট বাঁধিয়ে দিচ্ছিল।

আমার গলা শুকিয়ে এল, কান বোঁ বোঁ করতে লাগল। নিশ্চয়ই মূর্ছা যেতাম, তারপর সেখান থেকে টেনে আনো রে, কিন্তু হঠাৎ চেয়ে দেখি সামনেই বাঁশঝাড়। দেখে থমকে দাঁড়ালুম, অন্য একটা ভয় এসে কাঁধে চাপল। বাঁশঝাড়ের মধ্যে স্পষ্ট শুনলুম, খপখপ শব্দ— যেন বুড়ো সাপ নিবিষ্টমনে একটার-পর-একটা কোলাব্যাঙ গিলে যাচ্ছে।

গুপের দিকে তাকালুম, জায়গাটার থমথমে ভাব নিশ্চয়ই সেও লক্ষ করেছে। তার মুখটা অন্ধকারে সাদা মড়ার মতন দেখাচ্ছিল। জায়গাটাতে হাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ভালো করে শোনা যাচ্ছিল না।

আমার মনে হতে লাগল— আর কখনো কি বাড়ি যাব না? পিসিমা আজ মালপো ভেজেছেন। সে কি দাদা একা খাবে? মাস্টারমশাইও এতক্ষণে এসে বসে রয়েছেন, হয়তো শক্ত শক্ত অঙ্ক ভেবে রাখছেন। আঃ, গুপেটা কেন জন্মেছিল?

গুপে আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে বলল, 'চল্ কাছে যাই।' বাঁশঝাড়গুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল তারার আলোয় মধ্যিখানটা একেবারে ফাঁকা। আশেপাশে ঘন বিছুটি পাতা, সে জায়গাটা শুকনো ঘাসে ঢাকা। থেকে থেকে দু-একটা বুনো কচু গাছ, বিষম ভুতুড়ে গাছ।

তারপর চোখ তুলে আর যা দেখলাম, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। মনে হল ছেলেবেলায় এক বার মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখি ঘরের আলো নিবে গেছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার আর তার মধ্যে খসখস শব্দ, যেন কীসে বসে বসে শুকনো কীসের ছাল ছাড়াচ্ছে! এত কথা মনে করবার তখন সময় ছিল না, কারণ আবার ভালো করে দেখলাম দুটো সাদা জিনিস, মানুষের মতন, কিন্তু মানুষ তারা হতেই পারে না। জায়গাটা যে শাঁকচুন্নির আস্তানা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। স্পষ্ট একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধও নাকে এল। অন্ধকারে দেখলাম দুটো খুব লম্বা আর খুব রোগা কী, আপাদমস্তক সাদা কাপড় জড়ানো, মাথায় অবধি ঘোমটা দেওয়া, নড়ছে চড়ছে। দেখলাম তাদের মধ্যে এক জন ছোট্ট কোদাল দিয়ে নরম মাটি অতি সাবধানে খুঁড়ছে, অন্য জন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে পড়ল জ্যাঠামশাই একবার কলকাতায় পুরোনো চক-মেলানো বাড়িতে ছিলেন, সেখানে একদিন দুপুররাতে দিদিরা ভূত দেখেছিল— কলতলায় গোছা গোছা বাসন মাজছে। তারপর থেকেই তো ছোড়দির ফিটের রোগ। কিছুই না, ভূতের কুদৃষ্টি!

আবার তাকিয়ে দেখি খোঁড়া শেষ হয়েছে, গভীর গর্ত মনে হল। এতক্ষণ অত্যন্ত অস্বোয়াস্তি বোধ হচ্ছিল। ঘাড়ে মশা কামড়াচ্ছিল, চুলের মধ্যে কাঠপিঁপড়ে হাঁটছিল, আর পা বেয়ে কী একটা প্রাণপণে উঠতে চেষ্টা করছিল। গুপের পাশে তো অনেকক্ষণ থেকে একটা গোসাপের বাচ্চা ওত পেতে বসেছিল। গুপে দেখছিল না, আমি কিছু বলছিলাম না। ওকে কামড়াক, আমার ভালোই লাগবে।

সেই সাদা দুটো এবার উঠে দাঁড়িয়ে কী-একটা ভারী জিনিস অন্ধকার থেকে টেনে বের করল। গর্তের পাশে একবার নামাল, মনে হল ছালায় বাঁধা— মাগো কী!

একটা নতুন কথা মনে করে ভয়ে কাদা হয়ে গেলাম। এরা হয়তো ভূত নয়, খুনি-ডাকাত, কাকে যেন মেরে ছালায় বেঁধে গভীর অন্ধকারে বাঁশঝাড়ে নিরিবিলি পুঁতে বাড়ি চলে যাবে। কেউ টের পাবে না।

ভাবলাম নিশ্বাস অবধি বন্ধ করে থাকি। তারা এদিকে কালো জিনিসটাকে পুঁতে এ ওর দিকে তাকিয়ে বিশ্রী ফ্যাচফ্যাচ করে হাসতে লাগল কালো মুখে সাদা লম্বা লম্বা দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল। তারপর তারা অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সে-সন্ধ্যের কথা কাউকে বলতে সাহস হয়নি, বিশেষত গুপে যখন বাড়ির দরজার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলল, 'কাউকে বলিস না, বুঝলি? কাল আবার যাব, এর মধ্যে নিশ্চয় সাংঘাতিক কোনো ব্যাপার জড়িত আছে।'

আমি কথা না বলে মাথা নাড়লাম। বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না জ্যান্ত বাড়ি ফিরছি!

পরদিন মনে করলাম আজ কিছুতেই গুপের কাছে যাব না। এ তো ভারি আহ্লাদ! উনি শখ করে আগাড়ে-বাগাড়ে ভূততাড়িয়ে বেড়াবেন আর আমায় ওঁর সঙ্গে ঘুরে মরতে হবে! কেন রে বাপু! শাঁকচুন্নি যদি অতই ভালো লাগে— একাই যা না। আমায় কেন? অনেক করে মন শক্ত করে রাখলুম, আজ কোনোমতেই যাব না। এমনকী মেজোদাদামশাইয়ের বাড়ি চণ্ডীপাঠ শুনতে যাব, তবু বাঁশঝাড়ে যাব না।

সারাদিন গুপের ত্রিসীমানায় গেলুম না। ক্লাসে ফার্স্ট বেঞ্চে বসলুম। টিফিনের সময় পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে ব্যাকরণ বুঝতে গেলুম। এমনি করে কোনোমতে দিনটা কাটল। কিন্তু বাড়ি ফেরবার পথে কে যেন পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিল! আঁতকে উঠে ফিরে দেখি গুপে! সে বললে— 'মনে থাকে যেন সন্ধ্যে বেলা!'

হঠাৎ বলে ফেললুম, 'গুপে, আমি যাব না।'

সে একটু চুপ করে থেকে বললে, 'ও বুঝেছি, ভয় পেয়েছিস। তা তুই বাড়ি গিয়ে দিদিমার কাছে ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমির গল্প শোন গে, আমি কেলোকে নিয়ে যাব। তোর চেয়ে ছোটো হলেও তার খুব সাহস।'

বড়ো রাগ হল, বললুম, 'ওরে গুপে, সত্যিই কি ভয় পেয়েছি, ঝোপ-জঙ্গলে সাপখোপের বাসা তাই ভাবছিলুম। আচ্ছা, না হয় যাওয়াই যাবে।'

গুপে বলল, 'তাই বল্!'

আবার চারদিক ঝাপসা করে সন্ধ্যে এল। মাঠ থেকে ফিরতে গুপে ইচ্ছে করে দেরি করল। সূর্য ডুবে গেল, আমরাও বাঁশঝাড়ের দিকে রওনা হলুম। আজ আমি প্রাণ হাতে নিয়ে এসেছি, মারা যাব তবু শব্দটি করব না! বাঁশঝাড়ের কাছে এসেই কেমন গা-কেমন করতে লাগল। সত্যিই জায়গাটাতে ভূতে আনাগোনা করে। এত ভালো ভালো জায়গা থাকতে এই মশাওয়ালা বাঁশঝাড়ে আড্ডা গাড়বার আমি কোনো কারণ ভেবে পেলাম না।

আজ তারার আলো একটু বেশি ছিল, সেই আলোতে দেখতে পেলাম, তারা আবার এসেছে। ঠিক মানুষের মতন দেখতে, তবে পা উলটো কি না বুঝতে পারলাম না। মনে হল এদের উলটো হয়ে গাছে ঝোলা কিছুই আশ্চর্য নয়।

তারা এ ওর দিকে তাকিয়ে শকুনের মতন হাসতে লাগল। তারপর কোদাল বের করে ঠিক সেই জায়গাটা খুঁড়তে লাগল। দম আটকে আসছিল। কে জানে কী বীভৎস ভোজের আশায় ওরা এসেছে! খুঁড়ে সেই কালো জিনিসটা টেনে তুলল, দেখলুম ছালা নয়, চিত্তির-আঁকা কলসি। ভাবলুম গুপ্তধন।

তারা কলসির মুখ খুলতেই আবার সেই দুর্গন্ধ! নিশ্চিত কিছু বিশ্রী জিনিস আছে ওর মধ্যে! কিন্তু তারা খাবার কোনো আয়োজন করলে না।

এক জন আরেক জনের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট খুদির মায়ের গলায় বলল, 'হ্যাঁলা বাগদিবউ, পদিপিসি ঠিকই বলেছিল, দেখ্-না বাঁশঝাড়ে পুঁতে শুঁটকিগুলো কেমন মজেছে!'

গুপে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিউরে উঠল। বলল, 'চল্, পৃথিবীতে দেখছি অ্যাডভেঞ্চার বলে কিছু নেই!' আমি তৎক্ষণাৎ বাড়িমুখো রওনা দিলাম।

গুপে বাড়ির কাছে এসে বলল, 'কোথায় মড়া, কোথায় গুপ্তধন আর শুঁটকিমাছ! আর কারু কাছে কিছু আশা করব না।' আমি কিন্তু ব্যাপারটাতে খুশি হলাম।

কিছু বললাম না, কেবল মনে মনে সংকল্প করলাম, 'খোক্কসের হাতে বরং পড়ব, তবু গুপের হাতে কখনো নয়।'